রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন

(Synopsis)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পি এইচ. ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

লিটন মল্লিক

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: **A00ED0200518**

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর মনোজিৎ মন্ডল

ইংরেজি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৩২

২০২৪

ভূমিকা:

বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের চেতনা ও অনুভবে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি সকলের বেঁচে থাকার আশ্বাস ও প্রেরণা। বিশ্বজনের কাছে তাঁর বড়ো পরিচয় হল তিনি সত্যদ্রষ্টা-কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক বা শিল্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁকে কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ বলাই শ্রেয়। তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করা খুব সহজ কাজ নয়। বরং তাঁকে নিন্দায়, অপমানে, ধিক্কারে ছোটো করা খুবই সহজ। সে কাজ তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। তারপর তাঁকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ নিজেদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছে। কখনও তাঁকে বলা হয়েছে বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, কখনও প্রগতি বিরোধী বা ইংরেজদের ভক্ত। কিন্তু কালো মেঘের দল সূর্যকে কতক্ষণ আড়াল করবে? আপন-দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ সমুজ্জ্বল।

সৃজনশীল ও কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তবে কর্মী রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। অথচ তিনি মনে করতেন তাঁর দেশের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে তাঁর শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের জন্য। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের একটা দীর্ঘ বিস্তৃত প্রেক্ষাপট আছে। রবীন্দ্রনাথ ষোল বছর বয়সে 'ভারতী' প্রত্রিকায় 'বাঙালীর আশা ও নৈরাশ্য' নামে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সেই কৈশোর থেকেই দেশ সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি মনে করতেন যে, একমাত্র গ্রামের মধ্যেই মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ রয়েছে। আর এই গ্রাম-বাংলাই হল রবীন্দ্রনাথের প্রাণের নিকেতন (নিকেতনের অর্থ হল গৃহ) এবং মা লক্ষ্মী সেই গৃহেই তাঁর সার্বিক উন্নতির আসনটি পাততে চান। দেশের প্রকৃত শ্রীকে তিনি গ্রামের 'অন্নক্ষেত্রের' মধ্যে আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ করে গেছেন। গ্রামের নতশির, লাঞ্ছিত মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক পরিচয় হয় শিলাইদহ-পতিসরে জমিদারি দেখাশোনার সময় থেকে। তাঁদের আত্মশক্তিকে জাগরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর ধরে যে কাজ করেছেন তার সম্পূর্ণ কাহিনি আজও অজানা। কিন্তু আজকের গ্রামীণ সমস্যার প্রেক্ষিতে সে অজানা কাহিনি পল্লি-উন্নয়নের প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হওয়া দরকার।

একদিন নিজের স্বল্প সামর্থ ও কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের বীজ পুঁতেছিলেন। জীবন সায়হ্নে এসে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা তা থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। অন্তত সেই বীজকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায়

না। রবীন্দ্রনাথের একটা দুর্নাম ছিল তিনি ধনীসন্তান, তার চেয়ে বড়ো দুর্নাম ছিল তিনি কবি। মনের ক্ষোভে তিনি অনেকবার ভেবেছেন যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা তখন কোথায় ছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ, তার উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভাবনার সঙ্গে আজকের দিনের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদদের মতের স্পষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর রচনায় ও বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কাছে নিজের অর্থনৈতিক দর্শনের ঋণ স্বীকার করেছেন।

বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে দেশের উন্নয়নকে চিহ্নিত করেন না। তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অনাহার, ক্ষুধা, মানুষের গড় আয়ু প্রভৃতিকে উন্নয়ন-অনুন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করেন। ভারতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সংখ্যার তালিকার সঙ্গে নিরুৎসাহ, অবসাদ, অকর্মণ্যতা, রোগপ্রবণতা মেপে দেখার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড খুঁজেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা। তিনি সর্বদা জাতির ঐক্য, সমৃদ্ধি ও সার্বিক বিকাশের কথা বলেছেন। ভারতীয় সমাজ কখনও রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি, এদেশে সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো। অন্যান্য দেশে 'নেশন' নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সকল প্রকার সংকটের মধ্য দিয়েও তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। ভারতবাসী যে হাজার বছরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলিয়ে যায়নি, এখনও যে সমাজে নিম্নশ্রেণির মধ্যে সততা ও মনুষত্ব বিরাজ করছে, খাদ্যাভাসে সংযম এবং ব্যবহারে শালীনতা প্রকাশ পায়, এখনও যে ভারতবাসী পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করে, বহু কষ্টে অর্জিত ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, অভাবের সংসারে ভাই-বোনকে কলেজে পড়ায়- সে একমাত্র ভারতের প্রাচীন সমাজের জোরে। ইউরোপের নেশানের সাথে ভারতীয় সমাজের একটি প্রধান পার্থক্য হল ইউরোপের নেশান সজীব আর ভারতীয় সমাজ অন্ধ অনুকরণে জগদ্দল পাথরে পরিণত হয়েছে। এরা চোখ বন্ধ করে শুধু পূর্বপুরুষের কর্মফল ভোগ করছে। এখনও শুধু পূর্বপুরুষের সেই নিয়ম মেনেই চলেছে কিন্তু এদের মধ্যে পূর্বপুরুষের সেই চেতনা আর নেই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের জন্য এরা কোনো কাজ করে না। কিন্তু ভারতবাসী যদি পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত জাগ্রত মঙ্গলময় ভাবটি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সর্বত্র তাকে প্রয়োগ করত তাহলে ভারতের সেই প্রাচীন সনাতন সভ্যতাটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠত। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি নিজেদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য, এতেই সকলের মঙ্গল। একে ব্যবসা হিসাবে দেখা অনৈতিক। এর বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। সমাজের নিচ

থেকে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিস্বার্থ কল্যাণের বন্ধনে আবদ্ধ- এটাই ছিল ভারতবাসীর সব থেকে বড়ো চেষ্টার বিষয় এবং মনুষত্ব লাভের একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় যে কোনো উন্নতি হয়না তা নয় কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। আসলে ভারতে সমাজই চিরকাল সকলের ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

'স্বদেশী সমাজ' নির্মাণ করার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার গ্রাম ও সমাজের পুনর্গঠনের উপরেই জোর দিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মূলত হতদরিদ্র, অসহায়, গ্রাম-সমাজের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বদেশ নির্মাণ বলতে তিনি খুব স্পষ্টভাবে গ্রামীণ পল্লি-পুনর্গঠন ও শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

এই গবেষণাটিতে সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'Rabindranath Tagore: An Interpretation' নামক বিখ্যাত বইটির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদকে চারটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৯১-১৯০৮:

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ থেকে জনগণের রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে শুরু করেন। এই সময়ে তিনি শিলাইদহের জমিদার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাশাপাশি কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকাগুলিতে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে তাঁর রচিত স্বদেশি গানগুলি আপামর বাঙালিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। এই সময়ে রচিত বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা" (১৯০৫)।

১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ১৮৯০ -এর নভেম্বর মাসে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। এই সময়ে তিনি তাঁর 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি'-তে (১৮৯০) যে ভ্রমণ যাত্রার বর্ণনা করেন সেখানে তিনি তাঁর লেখার ধরন পরিবর্তন করেন। এখানে তিনি সাধু বাংলা থেকে ধীরে ধীরে চলিত বাংলায় লেখা শুরু করেন। লেখনীর এই রীতিই পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনার মূল আঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯১-এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এক বড়ো পরিবর্তন আসে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁকে প্রায়ই উত্তরবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হতো (উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ির যে জমিদারি ছিল সেগুলি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই সেখানে যেতে হতো)। জমিদারি দেখাশোনার পাশাপাশি ১৮৯১ সালে তিনি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাগুলিতে তিনি হিন্দুধর্মের

গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব হন। অন্যদিকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রার্থনা গৃহের (মন্দির) উদ্বোধন হয়। এই শান্তিনিকেতনই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

১৯৯০-এর পর থেকে শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার সময়ে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন, পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এইগুলি তাঁর ছোটোগল্পের ও কাব্যের প্রধান উপাদান রূপে ধরা দিয়েছে। এইসময় 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেছেন।

এদিকে সেইসময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কলকাতায় খুব উত্তেজেনা ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময় (১৮৯৩) চৈতন্য লাইব্রেরিতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) সভাপতিত্বে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রত্যেক জাতির দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে ইংরেজদের ঔদ্ধত্য, বর্ণবিদ্বেষ, ভারতবিদ্বেষের কথা বলেছেন। ইংরেজদের অনেক ক্ষমতা থাকলেও মানুষকে চেনার ও আপন করার গুণটি ছিল না। তারা 'উপকার করা', 'রক্ষা করা' এগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অবহেলা করেছে 'দয়া করা', 'স্নেহ করা', 'শ্রদ্ধা করা'-কে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপটিও তুলে ধরেছেন। কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত বিস্ময়কর যে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানাচ্ছেন তখন জাতীয় কংগ্রেস নীরব থেকে ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক টাউন হলে 'সিডশন বিল' বিষয়ক একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় তিনটি প্রস্তাব জনপ্রিয়তার সঙ্গে গৃহীত হয়। এই সভাতেই অন্য সুরে বাঁধা প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ রাখেন উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বলা ভাষণটি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি কেউই গুরুত্ব দেয়নি। কয়েকমাস পরে 'ভারতী' পত্রিকায় 'কণ্ঠরোধ' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ভাষণের শুরুতেই ছিল কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে শ্লেষ ও বক্রোক্তি। এরপর রবীন্দ্রনাথ তিলক ও নাটুভাইদের গ্রেপ্তার, ইংরেজ সরকারের সিডশন বিল ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন প্রবন্ধের ছত্রেছত্রে। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের দয়ার দানে পাওয়া 'পবিত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা' যে কতখানি অলীক, কতখানি ঠুনকো তাও প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। আসলে যে প্রস্তাবের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাষণ পাঠ করেন, তার মূল সুর, ভাব-ভঙ্গি ও মেজাজের সঙ্গে ঐ সভার কোনো সঙ্গতি ছিলনা। এ যেন এক উদীয়মান কবির অতি কষ্টে সভার কর্মকর্তা ও প্রবীণ নেতাদের রক্ত চক্ষু ও ভ্রূকুটি স্মরণ করে লেখনীকে সংযত রাখার প্রচেষ্টা।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখনীকে মূল হাতিয়ার করে তোলেন, এই সময়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধের মাধ্যমে আপামর বাঙালিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন, আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজা প্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কাছের বন্ধু চার্লস এন্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের সময়কালকে তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনকারী সময় বলে উল্লেখ করেছেন। চার্লস এন্ড্রুজের মতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের উৎস হল শিয়াইদহের গ্রাম্য জীবন, কলকাতা নয়। এই কারণে তৎকালীন সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখের জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল পৃথক। সেই সময়ের গ্রাম বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হয়েছিল, প্রথমেই এই মানুষগুলির আত্মশক্তির বিকাশের প্রয়োজন। অপরদিকে কলকাতার মধ্যবিত্ত নেতাদের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক সরকার, সাংবিধানিক পরিকাঠামো, বিতর্কিত রাজনীতি প্রভৃতি। জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই নিজে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির একজন হয়ে উঠতে না পারলেও তিনি গ্রামীণ সমাজকে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছিল।

১৯০৯- ১৯১৯:

১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনার দিক পরিবর্তন ঘটে। এই পর্বে তিনি নিজেকে জনমানস থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। যদিও তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ছিলেন তবুও তিনি তৎকালীন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাজনীতির সমালোচনা করেন এবং নিজেকে সরিয়ে আনেন। এরপর তিনি শান্তিনিকেতনের স্কুলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

সেই সময়ের জাতীয় স্তরের রাজনীতিও ছিল উত্তাল। বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) রাজদ্রোহের বিচারের সময় দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ (১৮৯৭), বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫), জাতীয় কংগ্রেসের বিভাজন (১৯০৭), অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন, বোমা বাঁধার অপরাধে অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তার, ইংরেজ অফিসার হত্যার চেষ্টার অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান (১৯০৮), বাল গঙ্গাধর তিলকের নির্বাসন প্রভৃতি একাধিক প্রেক্ষাপট নরমপন্থা বা আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে এক হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্ম দেয়।

১৯০৮-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেসের নেতাদের মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। বিশেষ করে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুটি দলে ভাগ হয়ে যাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে সমালোচনা করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণই ছিল রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের শেষ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। এই সময়ে উদ্ভূত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ গুপ্তহত্যায় বিশ্বাসী ছিল, একে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেননি। ১৯০৮ সালের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে এই বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিতে শুরু করে। তিনি মনে করেন এটা কখনো স্বাধীনতা অর্জনের পথ হতে পারে না। তাই তিনি এর বিকল্প পথ হিসাবে এবং জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে পল্লি-পুনর্গঠনের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন অনেক বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ইংরেজ সরকার কারারুদ্ধ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের 'পথ ও পাথেয়' ও 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯১৯-১৯২৯:

১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবারও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কারণ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা দেখে তিনি কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তিনি প্রতিবাদ সভার আহ্বান করলেও সেই সভায় কেউ তেমন সাড়া দেননি। তাই তিনি ইংরেজদের দেওয়া 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করে এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করেন। যদিও গান্ধীজির সাথে তাঁর জাতীয় আন্দোলনের মত ও পথ নিয়ে মতবিরোধ ছিল। তবুও এই পর্বে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তরাণ্বিত করার জন্য, মানুষের ওপর ইংরেজদের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন এবং তার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে রূপকের আড়ালে লিখলেন 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্ত করবী'-র (১৯২৬) মতো বিখ্যাত সব নাটক।

মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) উপস্থিতি তৎকালীন গণআন্দোলনকে এক নতুন রূপ দিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথও নতুনভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হন। যদিও একই সঙ্গে গান্ধীর সাথে তাঁর বেশ কিছু মতাদর্শগত পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন-

(ক) 'খাদি'-কে উন্নতির পথ হিসেবে নির্বাচন করা।

(খ) পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গান্ধীর নেতিবাচক মনোভাব।

(গ) 'স্বরাজ' প্রসঙ্গে গান্ধীর সঙ্গে সাংগঠনিক মতাদর্শগত বিরোধ।

যদিও এই দুই মহান নেতার মধ্যে মতপার্থক্য ছিল তথাপি তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া তাঁদের দু'জনকেই সমৃদ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য জীবনে সৃষ্ট অন্যতম দুটি বিখ্যাত নাটক এই সময়েই রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতা এবং তার প্রয়োজনীয়তার দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি মানব মুক্তি এবং সংগঠনের দ্বন্দ্ব, মানবতা বা মূল্যবোধের সাথে যুক্তির দ্বন্দ্ব এগুলিই নাটকগুলিতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। নাটক দুটি হল 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'। নাটক দুটি সহ অন্যান্য লেখাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের আরেকটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি হল শাসক বা এই জাতীয় যেকোনো ক্ষমতা বা সংগঠনের শীর্ষে যারা আছেন তাদের পরিবর্তন করা।

১৯৩০ – ১৯৪১:

এই পর্বে এসে আবার অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তাঁর সৃজনশীলতাকে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি এই পর্যায়ে এসে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধরণের লেখায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছেন। এমনকি এই সময়ে তিনি প্রধান জনপ্রিয় বক্তা হয়ে ওঠেন; ফলে তিনি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার কার্যে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তিনি কিন্তু এই পর্বে এসে আগের মতো খুব বেশি রাজনৈতিক কাজ কর্ম নিয়ে মেতে থাকতেন না। এই সময়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্যায়ে মানবতার কথা বলেছেন। বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর জীবনের চিন্তা ভাবনার মূল সুর। এটাই তিনি 'মানুষের ধর্ম'-এর মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার প্রধান বিষয়ও ছিল এটা। এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'ভারত পথিক রামমোহন' (১৯৩৩) প্রবন্ধেও এবং মহাবোধি সোসাইটিতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধের উপর এক বক্তৃতায়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৩) নাটক ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসেও প্রকট হয়ে উঠেছে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবিকতার অবক্ষয়, জাতিগত বিদ্বেষ, রাজনৈতিক হিংসা প্রভৃতি দেখে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি রচনা করেন 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)। তাঁর এই মানবিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ শুধুমাত্র এই প্রবন্ধগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর একদম শেষের দিকের কবিতাগুলিতেও তিনি তাঁর এই ভাবনার উল্লেখ করেছেন।

গবেষণা হয়নি এমন ক্ষেত্র:

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ, পল্লি-উন্নয়ন ও শিক্ষা ভাবনা- প্রতিটি বিষয়কে নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, এইসব গবেষণামূলক কাজগুলি সবই স্বতন্ত্র্যভাবে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লি-উন্নয়ন ও প্রকৃতির কোলে শিক্ষা ভাবনা যে আসলে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল এই বিষয়টি নিয়ে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি বললেই চলে। তাই গবেষক এই ক্ষেত্রটিকে তার গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

সমস্যার বিবৃতি:

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন

শিরোনামের কার্যকারী সংজ্ঞা প্রদান:

১। **জাতীয়তাবাদ:** ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শগুলি, স্বাধীনোত্তর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিতে সেই আদর্শের প্রভাব এবং ভারতীয় সমাজে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতের কারণস্বরূপ একাধিক আপাত-পরস্পরবিরোধী আদর্শের সম্মিলিত একটি আদর্শকে বোঝায়।

২। **পল্লি-পুনর্গঠন:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামের মানুষের উন্নতি করা। এখানে পল্লি-পুনর্গঠন বলতে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Idea of Inclusive Development এই ধারণাটিকে বোঝানো হয়েছে।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:

১। ১৮৯১- ১৯০৮ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও পল্লি-পুনর্গঠনের অনুসন্ধান করা।

২। ১৯০৯-১৯১৯ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী চেতনা কীভাবে তাঁকে পল্লি-উন্নয়নের কাজে ব্রতী করেছিলেন তার অনুসন্ধান করা।

৩। ১৯১৯-১৯২৯ এই পর্বে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ধারণা ও তার প্রভাব অনুসন্ধান করা।

৪। ১৯৩০-১৯৪১ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ধারণা ও মানবতাবাদের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা।

অধ্যয়নের তাৎপর্য:

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও জাতীয়তাবাদ নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। কখনো রাজনীতির জালে শুধুমাত্র মানচিত্রের প্রতি বা ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসাই হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু একটি দেশ বা জাতির এক কথায় দেশের সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসাই যে জাতীয়তাবোধ, এই সহজ কথাটিকে সকলে ভুলতে বসেছে। জীব বৈচিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও নিরন্তর লড়াইতে নিমগ্ন। লড়াই চলছে অর্থনীতিকে সচল রাখার, লড়াই চলছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার। অর্থনীতিবিদরা বলছেন গরিবের হাতে অর্থ দিতে আর তাতেই ঘুরবে দেশের অর্থনীতির চাকা। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে রয়েছে এক আলাদা গুরুত্ব। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে ঠিক একইভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে- এককথায় পল্লি-জীবনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের এক নিদর্শন রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে এক নতুন ভারত গড়ার সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সেই পল্লি-পুনর্গঠনের মন্ত্র আজ যেন আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে পল্লি জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জমিদারি পরিচালনার সময় থেকে। জমিদারি বলতে সকলে যে প্রজা পীড়নকারী শোষকের রূপ কল্পনা করে থাকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একদমই তার বিপরীত। পল্লি জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে এবং তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে এই দুঃখ দুর্দশাগুলি গভীর রেখাপাত করেছে। তাই তিনি এই জীবন যন্ত্রাণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন বারবার। তিনি বারেবারে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোটোগল্পে এমনকি কবিতায় ও গানে তাঁর পল্লি সম্পর্কিত ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পল্লীপ্রকৃতি’ প্রবন্ধে বাংলার গ্রামগুলির দুরবস্থার কারণ ও তার থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, আমাদের দেশে গ্রামের সম্পদ আত্মসাৎ করে শহর ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠছে অথচ গ্রাম থেকে যাচ্ছে সেই নিঃস্বই। গ্রামের যেসব কৃতি মানুষ শহরে চলে আসছেন তাঁরা আর গ্রামের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখছেন না। তাই শহরে এসে তাঁরা যে সম্পদ অর্জন করেন গ্রাম তার কোনো ভাগ পায়না।

তাই গ্রামের দারিদ্র দূর করার জন্য তিনি গ্রাম ও শহরকে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গঠনমূলক কাজ করার আহ্বান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ ‘উপেক্ষিতা পল্লী’-তে আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে দেশের নগর ও গ্রামের উন্নতির ভারসাম্যহীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অসাম্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, মানুষের সভ্যতা যতই গগনচুম্বী হয়ে ওঠে ততই তার পতনের কারণগুলিও প্রকট হতে শুরু করে। প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক ভারসাম্যকে যখন মানুষের কৃত্রিম সভ্যতা ছাপিয়ে যায়, তখন সে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। তিনি দুঃখ করে আরো লিখেছেন যে, দেশে আধুনিক সভ্যতা মানুষের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর মতে অধিকাংশ মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করে, তারাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছে বা অন্যান্য ভোগের সামগ্রী উৎপাদন করছে আর সেই গ্রামের মানুষের কাছেই লাভের অংশ খুবই কম ফিরে আসেছে।

‘পল্লীর উন্নতি’ শিরোনামে হিতসাধন মণ্ডলীর সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার মূলভাব অনুধাবন করতে পারলে বোঝা যায় তিনি গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন। তিনি মনে করতেন, সর্বাগ্রে পল্লির উন্নতি করাই দেশের মানুষের সবচেয়ে বড়ো কাজ।

তিনি তাঁর ‘সমবায় নীতি’ প্রবন্ধে দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যকে জয় করার মতো আত্মবিশ্বাস নেই। এই আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণ হল তাদের মধ্যে একতা নেই। তাঁর কথায়, “পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষ-ই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র”। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, পল্লিগ্রামে তিনি দেখেছেন দরিদ্র চাষি এবং সম্পন্ন চাষিদের ছোটো-বড়ো ক্ষেত পর পর রয়েছে। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী হাল-বলদ কম বেশি আছে। ফলে তাদের ফসলের পরিমাণও সেই অনুপাতে কম বেশি। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পরিশ্রম করছে এবং ফলও পাচ্ছে আলাদা আলাদা। এই অসাম্য দূর করার জন্যই তিনি সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোমার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, চাষিরা যদি তাদের সকলের ফসলের ক্ষেত ও মূলধন একত্রে করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকাজ করে তাহলে তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারবে। সেই ফসল একসাথে গোলায় তুলে তারপর বিক্রির ব্যবস্থা করলে খরচ পড়বে অপেক্ষাকৃত কম আর লাভও হবে বেশি। এই লাভের অর্থ তারা তাদের প্রত্যেকের মূলধনের অনুপাতে ভাগ করে নিতে পারবে। এইভাবে একজন ছোটো ও দরিদ্র চাষিও তার দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবে। এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে, একজন গোয়ালা একা দুধ না বিক্রি করে কয়েকজন মিলে যদি অনেকটা দুধ সংগ্রহ করে কোনো শিল্প গড়ে তোলে তাহলে মাথাপিছু লাভ হবে অনেক বেশি। এছাড়াও একাধিক কুটিরশিল্প, সমবায় শিল্প ইত্যাদি একাধিক কর্মযজ্ঞ তাঁর জাতীয়তাবোধেরই প্রমাণ দেয়।

ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে তিনি শান্তিনিকেতনে কল্পিত তপোবন আশ্রমের মতো প্রকৃতির কোলে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ। গুরু-শিষ্যের সুন্দর সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে তিনি আধুনিক ভারতে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদান পদ্ধতি আজও সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন করে চলেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও পল্লি-উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল যা গ্রামের মানুষকে নতুন দিশা প্রদর্শন করেছিল। বাংলার কুটির শিল্পগুলি ফিরে পেয়েছিল তাদের জীবনীশক্তি। ভারতীয় ঐতিহ্য কেবলমাত্র শিক্ষা আর জীবিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুস্থ জাতি গঠনে, শারীরিক সুস্থতা প্রভৃতি বিষয়কেও তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান দিয়েছেন। গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য স্থাপিত মাতৃসদন আজও শিলাইদহ-শ্রীনিকেতনে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে। কিন্তু আজকে প্রযুক্তির ব্যস্ত সময়ে আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে। নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে ভারতের প্রাণকেন্দ্র সেই গ্রামগুলিকে নিয়ে। জাতীয়তাবোধের আলোকে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে গবেষণার এটাই উপযুক্ত সময়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন, প্রকৃতির কোলে শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক গবেষণা হয়ে থাকলেও জাতীয়তাবোধের আলোকে পল্লি-পুনর্গঠন এবং প্রকৃতির কোলে শিক্ষা-এই দিকটি গবেষণার আড়ালে থেকে গেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই দিকটি গবেষণার বিষয় হিসেবে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সীমা নির্দেশকরণ:

গবেষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণাটি করেছে। প্রবন্ধগুলি হল-

প্রবন্ধ	রচনাকাল	প্রবন্ধ গ্রন্থ
1. প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	১৮৯১	সমাজ
2. নূতন ও পুরাতন	১৮৯১	স্বদেশ
3. আচারের অত্যাচার	১৮৯২	সমাজ
4. ইংরাজ ও ভারতবাসী	১৮৯৩	রাজা-প্রজা

5. রাজনীতির দ্বিধা	১৮৯৩	রাজা-প্রজা
6. ইংরেজের আতঙ্ক	১৮৯৩	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
7. ছাত্রসম্ভাষণ	১৮৯৩	শিক্ষা/ সংযোজন
8. অপমানের প্রতিকার	১৮৯৪	রাজা-প্রজা
9. সুবিচারের অধিকার	১৮৯৪	রাজা-প্রজা
10. রাজা ও প্রজা	১৮৯৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
11. কোর্ট বা চাপকান	১৮৯৮	সমাজ
12. অযোগ্য ভক্তি	১৮৯৮	সমাজ
13. কণ্ঠরোধ	১৮৯৮	রাজা-প্রজা
14. প্রসঙ্গ কথা- ১, ২, ৩, ৪, ৫	১৮৯৮	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
15. ব্যাধি ও প্রতিকার	১৯০১	সমাজ (পরিশিষ্ট)
16. নেশন কী	১৯০১	আত্মশক্তি
17. ভারতবর্ষীয় সমাজ	১৯০১	আত্মশক্তি
18. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	১৯০১	ভারতবর্ষ
19. বারোয়ারি মঙ্গল	১৯০১	ভারতবর্ষ
20. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম / প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ	১৯০১	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ / পরিশিষ্ট
21. ভারতবর্ষের ইতিহাস	১৯০২	ভারতবর্ষ
22. অত্যুক্তি	১৯০২	ভারতবর্ষ
23. রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	১৯০২	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
24. রাজকুটুম্ব	১৯০৩	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
25. স্বদেশী সমাজ	১৯০৪	আত্মশক্তি
26. সফলতার সদুপায়	১৯০৪	আত্মশক্তি
27. বঙ্গবিভাগ	১৯০৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
28. দেশের কথা	১৯০৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ

29. ইম্পীরিয়ালিজম	১৯০৫	রাজা-প্রজা
30. রাজভক্তি	১৯০৫	রাজা-প্রজা
31. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	১৯০৫	আত্মশক্তি
32. অবস্থা ও ব্যবস্থা	১৯০৫	আত্মশক্তি
33. শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা	১৯০৫	শিক্ষা/ সংযোজন
34. জাতীয় বিদ্যালয়	১৯০৬	শিক্ষা
35. সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী)	১৯০৭	সমূহ
36. ব্যাধি ও প্রতিকার	১৯০৭	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
37. যজ্ঞভঙ্গ	১৯০৭	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
38. পূর্ব ও পশ্চিম	১৯০৮	সমাজ
39. সদুপায়	১৯০৮	সমূহ
40. শিক্ষাবিধি	১৯১২	শিক্ষা
41. কর্মযজ্ঞ	১৯১৪	কালান্তর/ সংযোজন
42. স্ত্রীশিক্ষা	১৯১৫	শিক্ষা
43. পল্লীর উন্নতি	১৯১৫	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
44. ছোটো ও বড়ো	১৯১৭	কালান্তর
45. স্বাধিকার প্রমত্তঃ	১৯১৭	কালান্তর/ সংযোজন
46. সমবায় নীতি ১	১৯১৮	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
47. ভূমিলক্ষ্মী	১৯১৮	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
48. বিদ্যাসমবায়	১৯১৯	শিক্ষা
49. ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা	১৯২০	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
50. হিন্দু মুসলমান	১৯২২	কালান্তর
51. সমবায় নীতি ২	১৯২২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
52. শ্রীনিকেতন	১৯২২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি

53. চরকা	১৯২৫	কালান্তর/ সংযোজন
54. স্বরাজ সাধন	১৯২৫	কালান্তর/ সংযোজন
55. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	১৯৩১	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
56. দেশের কাজ	১৯৩২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
57. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	১৯৩৩	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ
58. বিশ্বভারতী ১-১৯	১৯৩৩	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ / পরিশিষ্ট
59. আশ্রমের শিক্ষা	১৯৩৬	শিক্ষা/ সংযোজন
60. নারী	১৯৩৬	কালান্তর
61. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	১৯৩৯	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
62. হলকর্ষণ	১৯৩৯	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
63. পল্লীসেবা	১৯৪০	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
64. সভ্যতার সংকট	১৯৪১	সভ্যতার সংকট

অধ্যায় বিভাজন:

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮)

তৃতীয় অধ্যায়: আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯)

চতুর্থ অধ্যায়: জাতীয়তাবাদের নতুন দিক: বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯)

পঞ্চম অধ্যায়: মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১)

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার পর্যালোচনা (Review of related studies):

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক পর্যালোচনা:

- নেপাল মজুমদারের (১৯৬৩) 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা ও অবদানের সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন আছে। ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও চিন্তা নায়কদের রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, রাওলাট আন্দোলন ও জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, খাদি ও চরকা বির্তকে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে, সমবায় ও কৃষি-সমস্যা, শিক্ষা সংস্কারে, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে, স্বরাজ-চিন্তায় ও পূর্ণ-স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও সাযুজ্য, প্রত্যেক পৃথক পৃথক বক্তব্যের মধ্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

  সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও বিশ্ব শান্তি আন্দোলন ক্রমেই যখন বিস্তৃত ও ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সেই সূচনা কাল থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সংকট ও বিশ্ব ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী ও নেতা এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, এবং কীভাবে তাঁরা সাড়া দেন, এককথায় ভারতে আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

  গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় উভয়ের চিন্তার সাযুজ্য ও পার্থক্য এবং পত্রবিনিময় ইত্যাদি কালানুক্রমিক ভাবে এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

- শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৬১) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজিতে 'নেশান' বা 'ন্যাশনালিজম' আর 'জাতীয়তাবাদ' বিষয় দুটি এক নয়। ঊনবিংশ শতকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়। বাংলায় এই জাতীয়তাবাদের জনক হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃতি এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের

ভিত্তির ওপর এই জাতীয়তাবাদের সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আচারে, ব্যবহারে, ভাষায় ও চিন্তায় ইংরেজকে অনুসরণ না করে নিজের দেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই ছিল এই জাতীয়তাবাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজনারায়ণ বসু এই উদ্দেশ্যে 'গুপ্ত সমিতি' গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতিতে যোগদান করেন এবং রাজনারায়ণ বসুর নিকট 'ভারত উদ্ধারের দীক্ষা' গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই এই জাতীয়তাবাদের আদর্শ ত্যাগ করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই নতুন মতবাদের সমর্থনে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের কথা বলতেন, ঋষি অরবিন্দ দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মত পোষণ করতেন এবং ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ না করে শ্রীঅরবিন্দের মতই সমর্থন করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তামূলক প্রবন্ধাবলী অপরূপ সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করলেও সেই সময়ে ভারতবাসীর মনে তা বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি।

- আহমদ রফিক তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার দিকটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি বেশ জটিল। সেখানে রয়েছে নানা মাত্রিক ভাবনার মিশ্র চরিত্র, তাতে স্ববিরোধিতারও অভাব নেই। তাঁর স্বদেশভাবনা যেমন রাজনৈতিক চিন্তা, তেমনি সমাজভাবনা নির্ভর। সেখানে যুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের উপলব্ধি, যে উপলব্ধির মধ্যমণি প্রাচীন ভারত, সনাতন ভারত। যে ভারতের চরিত্র সমাজপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান নয়। আবার সে সমাজ ভাবনায় একপর্যায়ে এসে যুক্ত হয়েছে পল্লি-পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিষয়ক আধুনিক চেতনা। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে, সর্বোপরি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের আগ্রাসন নিয়ে মতামত প্রকাশ। শেষোক্ত বিষয়টির গুরুত্ব সর্বাধিক এই কারণে যে, যখন ভারতে ইংরেজ শাসনে আধুনিকতার পত্তন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির রেনেসাঁস নিয়ে রবীন্দ্রচেতনায় যথেষ্ট মুগ্ধতা, তখনো ইংরেজের নিষ্ঠুর বিশ্ব আগ্রাসী তথা সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী।

পল্লি-পুনর্গঠন বিষয়ক পর্যালোচনা:

- ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ (২০১৯) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কৃষক সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পল্লি বিষয়ক চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রথম তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে ১৯০৪ সালে লেখা 'স্বদেশী সমাজ', ও পরবর্তীতে লেখা 'পল্লী প্রকৃতি' প্রবন্ধে। কিন্তু তাঁর পল্লি-উন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনের চিন্তা সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। জাতীয়তাবাদের রাজনীতি সামন্ততান্ত্রিক-মধ্যবিত্তনির্ভরতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গ্রাম উন্নয়ন এবং দুস্থ অবহেলিত কৃষক শ্রেণির উন্নতির গুরুত্ব স্বদেশিকতার পটভূমিতে ভদ্রলোকদের বুঝিয়ে দিতে। ১৯০৭ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তাঁর পল্লি-উন্নয়ন পরিকল্পনাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন। যে তিনটি বিষয়ের ওপরে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং জনসমাজের মধ্যে গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করা। কারণ গ্রামীণ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ শুধু দরিদ্রই নয় তারা শতকরা আশি জনই কৃষি কাজে নিয়োজিত। তিনি রায়তদের শিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে জমিদার, জোতদার, মহাজনরা তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতে না পারেন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য ও সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টায়, ক্রমে তিনি তার বিস্তার ঘটাতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যেসব কাজে অংশ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল প্রাথমিক জনশিক্ষা সহ শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তার, চিকিৎসা দান, পূর্তকর্ম যেমন- কূপ খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা-পুকুর সংস্কার ইত্যাদি, ঋণদায় থেকে কৃষকদের রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ সালিস-বিচার। তাই দেখা যায় দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করা তথা জনশিক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। ছোটোদের জন্য দিনে এবং বয়স্কদের জন্য রাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের লোকদের নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারে খরচ করার সামর্থ্য ছিল না। সেজন্য গ্রামের মানুষ সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেল। পতিসরে গঠিত হল 'হিতৈষী সভা'। সমিতির সদস্যদের অর্থে একজন কম্পাউন্ডার রাখা হল এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন কর্মসূচির মূল কথা ছিল সমবায় নীতির সর্বজনীন ও সুষ্ঠু প্রয়োগ। এ সম্পর্কিত বক্তব্যে তাঁর

অর্থনৈতিক চিন্তারও আভাস মেলে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, সমবায় প্রথার মধ্যে দিয়ে বড়ো পুঁজি এককভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। তিনি চাষিকে সমবায়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সমবায় ব্যাংকের সাহায্যে কৃষকের ঋণভার কমাতে বা মোচন করার দিকে নজর দিয়েছেন।

- অধ্যাপক শাইখ সিরাজ (২০১১) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও পল্লি জনজীবনের উন্নয়নের ভাবনা বর্তমান সময়ে কতটা উপযোগী তা তুলে ধরেছেন। জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির প্রশ্নে তাঁর দর্শন সত্যিই অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকুমাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্ব-চর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।' কিন্তু বিশাল এই দিক নির্দেশনা ও সৃজনশীলতার এই প্রেরণাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যেও অনেক খেদ রয়েছে। বলা বাহুল্য, সমাজের অনেক উন্নয়নের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা মডেল হতে পারে, কিন্তু সেগুলো তলিয়ে দেখাই হয়নি। আজও পর্যন্ত কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা চর্চা হয়, ততটা চর্চা তাঁর দেশ গড়ার সূত্রগুলো নিয়ে হয় না। বহুযুগ পার হলেও রবীন্দ্রনাথের এদিকগুলো নিয়ে খুব বেশি গবেষণা যেমন হয়নি, তেমনি এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়েনি নীতি-নির্ধারকদেরও। আজ সময়ের প্রয়োজনেই এ দিকটিকে মনোযোগদেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীনিকেতন' এই বাংলার অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি হলেও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকপাল হিসাবেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু দেশের মানুষ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, অর্থনীতি, গ্রামোন্নয়ন, সমবায়, সমাজ ব্যবস্থা ও সংগঠন এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশাল অবদানকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যত দ্রুত আন্তরিক হবে এবং অনুসরণ করবে তত দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে দিশাহারা প্রান্তিক মানুষের মুক্তি।

- শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৯৬৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্টেটে অর্থাৎ শিলাইদহ-কলকাতায় দীর্ঘদিন চাকুরী করেছেন। 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর সেই চাকরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি তিনটি গ্রন্থের সংকলন, যথা- 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', ও 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে'। গ্রন্থ তিনটিতে লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী পদ্মাপারের ও শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দৈনন্দিন জীবন জীবিকা, জমিদারির কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করেছেন।

শিলাইদহ ও কলকাতার এস্টেটে আসা অনেক মানুষদের সম্পর্কে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। শিলাইদহের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, একজন কবি কীভাবে জমিদার হয়ে উঠছেন- গ্রন্থটিতে তারই বর্ণনা রয়েছে। তিনি জমিদারিতে যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন সেকথাও গ্রন্থটিতে রয়েছে। তিনি যে আর পাঁচজন জমিদারের মতো নন, তা 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উন্নতিসাধন, তাই তাঁর জমিদারিতে তিনি একটি ব্যতিক্রমী ছাপ রেখে গেছেন। কোথাও তিনি প্রজাদের খাজনা মুকুফ করে দিয়েছেন, কোথাও বা তিনি মোকদ্দমার পর কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির টাকা ছাড় দিয়ে কীভাবে তার বাজার বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির জমিদারের তালিকা রয়েছে অর্থাৎ কোন সদস্যের কোন অংশে জমিদারি, সেই অংশটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সামন্ততন্ত্র প্রথা বিলোপের ঘণ্টাটি এখান থেকেই বাজিয়ে ছিলেন।

- অধ্যাপক কৌশাম্বী চক্রবর্তী (২০১৬) তাঁর 'পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথের পল্লি-উন্নয়নের দিকটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই দেশের কৃষকদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি গ্রাম বাংলার উন্নয়নের জন্য কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের গ্রামগুলি দুর্দশা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগের অভাব গ্রামের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই অবস্থা থেকে গ্রামের মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে যে সমাধানের পথ দেখিয়েছেন, তা এই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিক। একথা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়নের কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেননি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামের মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বহু কাজ করেছেন যা আজ থেকে একশো বছর আগে সত্যিই গোটা পৃথিবীর কাছে এক চরম বিস্ময়।

- সুধীরচন্দ্র কর (১৯৪৮) তাঁর 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টির নাম হল 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ'। এই অধ্যায়ে তিনি দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা চাষাভূষা, কুলি-মজুর অর্থাৎ খেটে খাওয়ার দল- এদের সঙ্গে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাবের ও কর্মের সঙ্গে কোথায় কতটা যোগ সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদার,

কৃষকরা তাঁর প্রজা, সুতরাং তাদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর একটা যোগ থাকার কথা। জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগ জমিদার হিসাবেই। কিন্তু খাজনা আদায় এবং বিষয় ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন জমিদারি সুলভ মানসিকতার বেড়া ডিঙিয়ে চলে এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে। শিলাইদহ অঞ্চলেই তিনি প্রথম কৃষক বা সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি আসেন। অবশ্য আর একবার সেই জনযোগের প্রবণতা দেখা যায় তাঁর শ্রীনিকেতনের পল্লিসেবা ক্ষেত্রে। শ্রীনিকেতনেই তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার সার্থক ও বাস্তব রূপদান করেছেন। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেলেন বিদেশে- রাশিয়ার সাম্যবাদীরা তাঁকে নিয়ে দেখালেন তাদের নবজীবন গড়ার কর্ম-কৌশল। পল্লিকেন্দ্রে ঘুরে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ সুসাংস্কৃতিক জীবনকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। রাশিয়ার জনসেবা প্রণালী এবং দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার আলোচনায় পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন দেশের উন্নতি করতে গেলে সবার আগে গ্রামের এই দরিদ্র মানুষগুলির আর্থিক উন্নতি দরকার। গ্রামের মানুষগুলির শিক্ষা-দীক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোকশিক্ষার সংস্থান, আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি, কুটির শিল্প ও সমবায় ধন ভান্ডার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য সমিতি, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধুলার কাজে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ব্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন। তাঁর মতে, একটি পল্লিকেও যদি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে আদর্শ পল্লিতে গড়ে তোলা যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হবে। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার দিকটিও তুলে ধরেছেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করে আদর্শ জীবন ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তার করে দেশে সমুন্নত মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টির কাজে ব্রতী হলেন। কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে নানা সমাজ, নানা চিন্তা ধারা, নানা শিক্ষা প্রণালীর সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রাথমিক ব্রাহ্মণিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল বিশ্বমানবের। সমগ্র পৃথিবীকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের সকলকেই মেলাবার নীড় রচনা করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'বিশ্বভারতী'তে। এভাবেই সুধীরচন্দ্র কর 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন ও শিক্ষার দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

- তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (১৯৭১) 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতার দ্বিতীয় বর্ষে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে যে চারটি বক্তৃতা দেয় তার সংকলিত রূপ।

  প্রথম বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয় পর্বের বর্ণনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন 'পোস্টমাস্টার' 'ছুটি' ইত্যাদি গল্পের চরিত্রগুলির কীভাবে এসেছে। শিল্প ও শিল্পী নিয়ে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে "মহাকবি রবীন্দ্রনাথের" শিল্পের বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প শুধুমাত্র শিল্পীর চিত্ত প্রসূত নয়, তার সঙ্গে সোনার অলংকার গড়ার মতো প্রয়োজন হয় বাইরের অভিজ্ঞতার। তবে সোনা ও অলংকার যেমন একশো ভাগই একই জিনিস নয় তেমনি শিল্পীর অন্তর-আত্মা এবং বাইরের অভিজ্ঞতা ভিন্ন- তা বললে ভুল করা হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র অংশ থেকে তিনি একটি দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। আসলে এই অংশটি তাঁর চারদিনের বক্তৃতার ভূমিকার অংশ। তিনি বাকি তিন দিন যে তিনটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং যেটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেই তিনটি অংশ হল- প্রথমাংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাসী', দ্বিতীয় অংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজ' এবং তৃতীয় অংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি'। প্রথমাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তিনি 'গোরা'র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। এই অংশটিতে তিনি ভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা তা গোরার উক্তি দিয়েই প্রকাশ করেছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০০ এই সময়ের চিঠিপত্র ও গল্পে গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের যে পরিচয় রয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি একাধিক চিঠিপত্র এবং ছোটোগল্পের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

  পরের অংশ অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ' এখানে 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিকতা' ও 'পলিটিক্যাল স্বদেশিকতা' সম্পর্কে একটি আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-প্রেম এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি' এই অংশটি শেষদিনের বক্তৃতা। এই অংশটি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং জীবনের প্রথম কাল থেকে পরিণত বয়সের কবিকৃতি আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে পল্লি জীবনের লৌকিক চিত্র। প্রকৃতি যেমন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র উঠে এসেছে তেমনি পল্লির প্রকৃতি হিসেবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে পল্লির মানুষ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পল্লি প্রকৃতির সম্পর্কের কথা এই অংশটিতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও 'রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ' শিরোনামেও একটি আলোচনা রয়েছে।

শিক্ষাভাবনা বিষয়ক পর্যালোচনা:

- ড. জাহিদা মেহেরুননেসা (২০১৬) তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা এবং আজকের দিনের সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা সময়ে নানা ভাবনার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের প্রকৃতির সহযোগে শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন অতীতের সেই শিক্ষাব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন। তিনি নিজেও শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষাকে তিনি কখনো অনায়াসে অর্জনের বিষয় করে তোলেননি। ছাত্ররা যাতে শক্ত বিষয় ভাঙতে পারে বড়ো বড়ো কথা বুঝতে পারে সেই ব্যবস্থাই তিনি করতেন। তাই তাঁর ছাত্ররা দ্রুতচিন্তা করার মতো ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ছাত্রজীবনে শিথিলতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি ছাত্রদের কঠিন বই পড়াতে তিনি দ্বিধা করতেন না। একবার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে তিনি ইংরেজ দার্শনিক ও সাহিত্যিক John Ruskin-এর বই পড়িয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনকে তিনি নিজের শিক্ষাচিন্তার আদর্শে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিজস্ব শিক্ষাদর্শন ও ভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আশ্রম পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শান্তিনিকেতনে প্রবাসীরাও বিদ্যার্জনের জন্য আসছেন তখন তিনি ভেবে খুশি হলেন যে, শান্তিনিকেতন বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে বাইরের ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। একে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করে তুলতে চেয়েছেন যেখানে শিশুকাল থেকে ছাত্ররা একসাথে থেকে একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করতে পারবে, যেখানে শিক্ষাচর্চা হবে সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত।

অধ্যায় অনুযায়ী সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়টি হল ভূমিকা। এই অধ্যায়টিতে মূলত গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার তাৎপর্য, সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার পর্যালোচনা (রিভিউ) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও অধ্যায়টিতে গবেষণার জন্য রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত প্রবন্ধের তালিকাটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম **রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮)**। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন সেই সময় তাঁর না ছিল সম্পদের সংস্থান, না ছিল কোনো জোরালো সমাজ গঠনমূলক সাংগঠনিক ভিত্তি। অন্যদিকে সেসময়ে অনড়, স্থবির, শতবিভক্ত সমাজ জীবনে প্রতিকূলতা ছিল পদে পদে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-উন্নয়নের ধারণা ও তার প্রয়োগ সমাজের সব স্তরেই কিছুটা হলেও গতিশীলতা এনে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের এত বৈচিত্র্য এবং সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তন এই পর্বের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় লেখনি অনেক আগে শুরু করলেও রাজনৈতিক লেখা পত্রে তাঁর প্রবেশ 'মন্ত্রী অভিষেক'-এর (১৮৯০) হাত ধরে। তাঁর এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল সেই সময়কার পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতি ও ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার। তাই এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র লেখনীর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। প্রথমে দিকে তিনি যেমন সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাগুলিতে যোগদান করেছেন, দিয়েছেন বক্তৃতাও। সেই বক্তৃতাগুলিই পরবর্তীকালে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে তিনি খুব সচেতনভাবে রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি তার কারণ ছিল পারিবারিক ও প্রিয়জনের মৃত্যু। তিনি কখনো মনে করেননি যে, যা চলছে তাকে সবসময় পুরোপুরি সমর্থনই করে যাবেন বা সব কিছুকে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন। তিনি সবসময় তাঁর যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কখনো তার সমালোচনা করেছেন আবার কখনো তাকে পূর্ণ সমর্থনও জানিয়েছেন। প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যাবলীগুলিকে সমর্থন জানালেও পরবর্তীকালে আর তা করতে পারেননি। আবার স্বদেশি আন্দোলন ও স্বরাজের প্রশ্নেও তিনি সমকালীন নেতৃত্বদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। দেশের জন্যে যখন যেটা ভালো ও কল্যাণকর বলে তিনি ভেবেছেন বিনা দ্বিধায় সেটাই করেছেন। জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর সেই ভাবনা আজ সব থেকে বেশি করে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ বড্ড ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এমনকি ভয়ংকর বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদ আর দেশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না। তাঁদের জাতীয়তাবাদ এসে দাঁড়িয়েছে ভাষা, রাজ্য, ধর্ম, অর্থ বা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দেশ ও জাতি পক্ষে ধ্বংসাত্মক। এই সংকীর্ণ

জাতীয়তাবোধ দেশের উন্নতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান চর্চা প্রভৃতির পরিপন্থী। তাই রবীন্দ্রনাথের দেখানো জাতীয়তাবাদ ও তাঁর নির্দেশিত পথ আজ সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে পাথেয়।

আবার গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে লোকমান্য তিলকের ডাকে পশ্চিম ভারতে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেকালে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেননি। যদিও মহামান্য তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি এই আন্দোলনের সরাসরি কোনো সমালোচনাও করেননি। এই পর্বেই উঠে আসে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে বিনাশ করে ইংরেজদের সুবিধা ভোগ করার কথা। এই প্রসঙ্গটি আজকের দিনে যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আসলে জাতীয়তাবাদী ঐক্য একটি দেশ ও জাতির উন্নতির অন্যতম প্রধান সোপান। তাই এই ঐক্যকে বিঘ্ন করার কাজ সেদিন তুলে নিয়েছিল ইংরেজ সরকার। আজও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে দাঙ্গা ও ধর্মীয় বিবাদের খবর পাওয়া যায়। তখন রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলিও আরও বেশি করে কার্যকরী হয়ে ওঠে। একশো কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করে বলে গেছেন ভারতবাসী আজও তা অন্তরে ধারণ করতে পারেনি। আজও ভারতবাসী তাঁদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় নির্ধারণ করেন তাঁদের ধর্ম দিয়ে। আজও তাঁরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্মণ, হরিজন প্রভৃতি জাতপাতের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভাবতে পারেনি তাঁরা ভারতবাসী, হতে পারেনি এক জাতি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধর্মীয় ভেদাভেদকেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন ও দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলে উল্লখ করেছেন। এই ধর্মীয় ভেদাভেদের মুনাফা পরাধীন ভারতবর্ষে তুলেছিল ইংরেজরা, আজ তুলছে দেশের রাজনৈতিক নেতারা। আজও দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মের জালে আটকে আছে। আর ঠিক সেই কারণেই আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র জাতির কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন যাতে ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে। অন্যদিকে ১৯০৫ -এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যখন বয়কটই প্রাধান্য লাভ করেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, কোনো কিছু না গড়ে শুধুমাত্র বর্জনের মাধ্যমে, ত্যাগের মাধ্যমে জাতির উন্নতি হতে পারে না। এমনকি সেই প্রশ্ন যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এসেছে, সেখানেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তার বিরোধিতা করার জন্য। অন্যদিকে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' মতো নির্মম স্বাধীনতা হরণকারী নিয়মের বিরুদ্ধেও তিনি রীতিমতো কলম ধরেছিলেন।

এই পর্বটিকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের সূচনাকাল হিসেবেও ধরা যেতে পারে। কারণ পরবর্তী কালে তার প্রায়োগ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপ্রস্তুত যেন এই পর্বেই ঘটেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা যেমন শান্তিনিকেতন, আর পল্লি-পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্র ছিল শিলাইদহ ও শ্রীনিকেতন। আবার এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গে বিরোধি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও ১৯১০ -এর পর আবার নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি হল **আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯)**। এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে বোধহয় সবচেয়ে ঘটনা বহুল সময়কাল। তবে সেই সবকিছু ছাপিয়ে, একাধিক বহির্মুখী কার্যকলাপের পাশাপাশি তিনি এক নিগূঢ় অন্তর্মুখী সাধনাতে ধীরে ধীরে লিপ্ত হচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন 'আমার সঙ্গে অধীশ্বরের' মিলন। এই সময়কালের মূল বহির্মুখী কার্যকলাপ মূলত শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাইতো তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের জগতেও চলছিল একের পর এক ঘটনাবহুল পট পরিবর্তনের পালা। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে নিজেকে এক নতুন কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করেন। তাঁর আস্থা ছিল খণ্ডতায় নয়, পূর্ণতায়। তিনি খুঁজে নিচ্ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের আদি ও মূলভাব মিলন বা ঐক্যকে। ভারতের উন্নতির জন্য এই ঐক্যই প্রধান ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সে মিলন ধর্মের, জাতির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা তৎকালীন সময়ে সমাদৃত হয়নি। এটিও হয়তো তাঁর রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। এই সময়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। পাশাপাশি শিলাইদহ ও পতিসরের কাজগুলিও দেখাশোনা করছিলেন। একজন মানুষ কতটা পরিশ্রমী হলে একসঙ্গে এতো কাজ করতে পারেন! আজকের দিনে প্রযুক্তি মানুষের জীবন-যাপনকে অনেক সহজ-সরল করে দিয়েছে, বিনিময়ে নিয়ে নিয়েছে মানুষের উৎসাহ, কৌতূহল ও পরিশ্রম করার মানসিকতা। আর ঠিক সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়, উদ্যম ও উদ্যোগ আজ সকলের কাছে এতো বেশি করে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বলতে মনে করতেন যে, যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একসঙ্গে মিলে একটি যোগাসন রচনা করবে সেটাই সত্যিকারে আশ্রম। আর সেরকম একটি ক্ষেত্রকেই তিনি শিক্ষাদানের আদর্শ স্থান বলে মনে করতেন। তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবন সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মচর্য-র সংযমকে তাঁর আশ্রমেও গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে গোটা শিক্ষিত সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকেই ভারতবাসীর জন্য উপযোগী বলে মনে করছেন। কারণ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকর্মচারি তৈরি করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনই চাননি ভারতবাসী লেখাপড়া শিখে চাকর তৈরি হোক, তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসী শিক্ষিত হয়ে নিজের অধিকারটা বুঝে নিক আর কোনোকিছুর জন্যে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকে, নিজেদের ভালো-মন্দ

যেন নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কখনো উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি, তা সে প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যের। কিন্তু আজ উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য সমগ্র বিশ্ব অশান্ত ও জর্জরিত, চারিদিকে শুধু যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, বিঘ্নিত হচ্ছে বিশ্ব শান্তি। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্য এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐতিহ্যের সেই সার কথাটি তুলে ধরেছেন বারবার, যা আজ নতুন করে আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যখন জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথই সমগ্র জাতিকে পথ দেখান।

রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই সময়ে একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যুর সাক্ষী থাকছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য সমালোচিত হচ্ছেন বারবার কিন্তু কোনো কিছুর জন্যেই তাঁর দেশের মঙ্গলের কাজ থেমে থাকেনি। বরং তিনি আরো বেশি করে দেশের উন্নতির কথা ভেবেছেন। তার প্রমাণ শিলাইদহ, পতিসর, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। আশ্রম বিদ্যালয়ের দর্শনগত কাঠামোটি তিনি একাধিক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। আর সেই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তিনি তাঁর যথা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন, এমনকি তার জন্য স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। আবার কখনো নোবেল পুরস্কারের টাকা বিদ্যালয়ের কাজে লাগিয়েছেন। আবার কখনো হৃদয়কে শক্ত করে কেবলমাত্র খরচ কমানোর জন্য আশ্রম বিদ্যালয় থেকে প্রিয় শিক্ষক এবং কর্মীদের বিদায় জানালেও অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই আশ্রম বিদ্যালয় তাঁর কাছে ছিল সন্তানসম। তাই প্রিয়জনদের কাছ থেকে এর বিন্দুমাত্র অবহেলা বা লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখলে সেখান থেকে তিনি খুব সহজেই নিজেকে সরিয়ে নিতেন। শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ নজর। তাই ইতিহাস বইয়ের ছোটো ছোটো গল্পগুলো সংগ্রহ করে ছেলেদেরকে পড়াতে বলেছেন। যা ইতিহাস পরিচয়ের সাথে সাথে বালকদের মনে মুগ্ধতা ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। মূল পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ এই ইন্টারনেটের যুগে তথ্য ভাণ্ডার যখন মানুষের হাতের মুঠোয়, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ নেই, তারা হারিয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের বোধও, সেই সময় আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে আশ্রম বিদ্যালয়ের জীবনযাপন ও সহপাঠ্যক্রমের গুরুত্ব। শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ শিক্ষকদের ক্ষেত্রটিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী সর্বাধিক বেতনভোগী শিক্ষককেও তিনি নিযুক্ত করেছেন। এই পর্বে তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়লেও আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে তাঁর উৎসাহ ও চর্চা কিন্তু কখনোই বন্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এলেও ইংরেজের বিষ নজর থেকে তিনি সরে আসেননি। তাই জোড়াসাঁকোর পাশাপাশি আশ্রম বিদ্যালয়েও ইংরেজ গুপ্তচরের আনাগোনা লেগেই থাকতো। এমনকি ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে আইন জারি করে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি বন্ধ করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিদ্যালয়টি ছিল জীবন সাধনার ক্ষেত্র। এ শুধু একটি স্কুল ছিল না, এখানেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির স্বাদ। তিনি তাঁর প্রিয়

আশ্রম বিদ্যালয়টিকে উপনিষদের চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হৃদয়ের ভক্তির সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আজ যখন পাশ্চাত্যমুখী আড়ম্বরপূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির রমরমা তখন মানুষ ভুলছে হৃদয়ের শিক্ষা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার নামে নামছে অস্বাস্থ্যকর ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয় আজ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিল নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল। যেমন গোখলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিল, মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবিত কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ইত্যাদি। আর এই সময়ের রচনায় বারবার হিন্দু কথাটি উঠে এসেছে। এখানে তিনি সেই হিন্দু সমাজের কথা বলেছেন যেখানে বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান মুসলমানরাও হিন্দু সমাজের অংশ হতে পারতো। হিন্দু বলতে হিন্দুত্বের ধারণাটিকে আরও বড়ো করতে চেয়েছেন। তাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, হিন্দুত্বের ধারণাটি যদি আরও বড়ো করে তোলার চেষ্টা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, তাহলে তা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন মানুষ ধর্ম বলতে বিচারহীন আচারকেই বোঝে, রবীন্দ্রনাথ শতাধিক বছর পূর্বে সেই আচারকে বাদ দিয়ে তার মহত্ত্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি প্রথমে বিশ্বকে স্থান দিতে চেয়েছেন, চেয়েছেন বিচ্ছিন্নতার-বিরোধের অবসান। অথচ বর্তমানে বিরোধই প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই কালপর্বেই তিনি সম্মানিত হয়েছেন নোবেল পুরস্কারে। আবার ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেছেন 'নাইটহুড' উপাধি।

আজ আড়ম্বর প্রিয় মানুষ নিজের সৃষ্টিকে, কৃষ্টিকে, যোগ্যতাকে যখন বারবার পুরস্কারের মাপকাঠিতে মেপে নিতে চান, তখন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে পথ দেখাতে পারেন। নিজের মুক্তি সাধন নয়, দেশ এবং দেশবাসীকে মুক্তির পথ এনে দিতে চেয়েছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি শুধু আজ নয় আগামী কয়েক শতাব্দী ধরেও সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়টি হল **জাতীয়তাবাদের নতুন দিকঃ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯)**। এই পর্বটি আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ এখানে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে যেমন একটি জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করে তুলতে চেয়েছেন তেমনি ভারতের প্রাণ ভোমরা গ্রামগুলিকেও পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের উন্নতির

পথ খুঁজেছেন। আজকের দিনে যেখানে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ পদ ও ক্ষমতার আস্ফালনে মুখ লুকাচ্ছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই পদ বা ক্ষমতা চাননি, আর তাই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন। কিন্তু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংকটের সময় তিনি কলম ধরতে বা সরাসরি তার প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে, নিজের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের বিদ্যাস্থানেরই গুরুত্ব নেই। সেই গুরুত্ব পাওয়ার জন্য ভারতবাসী বিদেশি পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করে। তবে তিনি দেশিয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চারও আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধি বৃদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ, রসবোধ ইত্যাদি বিকাশকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সামগ্রিক বিকাশ বলে মনে করতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীর শিক্ষা দর্শনের এটাই ছিল সার কথা। বিশ্বভারতীতে সাহিত্য, সংগীত, নাচ, চিত্রকলা ইত্যাদি সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ আজ মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্ব তলানিতে এসে ঠেকেছে।

তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটি কো-অপারেটিভ স্টোর খুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায় সমিতির ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষা যে কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়, জীবনে চলার পথে তাকে যে পাথেয় করে তুলতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা আবারও একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আজকের দিনে যখন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে কোনোক্রমে একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত হন, তখন কোথাও গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বাণীটি অভিভাবকদের দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার ও উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা চালু করছেন, সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলাতে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আসলে তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে স্বদেশি ভাষা পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চাওয়া হয়। হয়তো অনেকেই আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপারটা নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হবেন, কিন্তু বিষয়টিতে তিনি আনন্দিত হলেও খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি আবেগের চেয়ে সমকালীন পরিস্থিতিকে বিচার করে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করতেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা ভাষা তখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠার উপযুক্ত হয়নি। যদিও তিনি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি ভাষাগুলি এখন

পর্যন্ত যে সেই স্তরে বিস্তার লাভ করে উঠতে পারেনি, সেটিও জানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি স্বদেশি ভাষাগুলির বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে লোকসাহিত্য ও উপভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বভারতীতে তিনি ভারতীয় প্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে ছাত্রদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। এবার এখানে প্রশ্ন আসতেই পারে তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী ছিলেন? উত্তরটি হল একেবারেই না। কারণ সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি বিদ্যালয়ে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তিনি উইন্ডমিল ও ছাত্রদের রাতে পড়ার জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও সেকালের ছাত্র সমাজ তাঁর এই দূরদর্শিতার সাথে পাল্লা দিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এও বলে দেন- বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিলে শিক্ষককে বা উপদেষ্টা মন্ডলীকে কতখানি দূরদর্শী হতে হবে। অথচ আজও ভারতীয়রা যে ভুলটি করে তা হল ভারতীয় ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভুল ভাঙিয়েছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক যুগে বাস করতে হলে শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না, চীন ভারতের ভালোটুকু গ্রহণ তো করতেই হবে, তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিকেও গ্রহণ করতে হবে। তবে যন্ত্র সভ্যতা যাতে মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে ফেলে সেদিকেও সর্তক থাকতে বলেছেন।

আবার আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝা যায়, কৃষি কাজ এখনো পর্যন্ত সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। আজও কেবল তারাই চাষ করে যাদের সঙ্গে শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই কবে বলে গেছেন চাষিকেও বিজ্ঞান শিখতে হবে বা বিজ্ঞানকেও চাষের কাজে যোগ দিতে হবে। চাষের সঙ্গে শুধু লাঙ্গলের ফলার আর দেশের মাটির সংযোগ নয়, ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে কৃষির যোগ থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সেদিনের সেই উপদেশ আজ আরো আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তাহলে কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ একদিন অর্থনৈতিকভাবেও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক এবং আত্মিক বিকাশের জন্য শিক্ষার কথা বলেছেন সে শিক্ষা আজকে আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এখন শিক্ষা হয়ে গেছে জীবিকা উপার্জনের উপায়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করবে তা পরে নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বলা বাহুল্য সেকালে ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দেরকে সেই সুযোগ দেয়নি। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও ভারতবাসী সেই শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করতে পারেনি। আজও বিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কেরানি তৈরির শিক্ষা। আর রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্যি করে এখনও ক্রমশ বাড়ছে বেকারত্বের সংখ্যা। কারণ শিক্ষায় চাহিদার চেয়ে যোগান অনেক বেশি। আজও কেবলমাত্র রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন দিয়েই সমগ্র

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং সেই পরিবর্তনই আনতে পারে সত্যিকারের আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ।

অনেক সময় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থের অভাবে বহু সংকল্প থেকে পিছিয়ে আসেন অনেকে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ দেখিয়েছেন ভারতবাসীকে। অর্থের অভাবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য যে কোনোদিন অধরা থাকতে পারেনা তা তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। সবার প্রথমে যা দরকার তা হল কার্যসিদ্ধির দৃঢ় মনোবল নিয়ে মাঠে নামা। আসলে মানসিক আত্মনির্ভরতাই সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানে অর্থ কোনো বাধা হতেই পারে না। শুধু এই মনোবল যোগানোর জন্যেই রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অন্যতম পথ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন মডেল। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীনিকেতনে একের পর এক তৈরি করছেন শিল্প ভবন, শিক্ষাসত্র, গ্রাম সমীক্ষা, শিক্ষাচর্চা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি। লোকশিক্ষা সংসদ তৈরি করছেন গ্রামের লোকেদের প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জন্য। গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে তিনি জোর দিয়েছিলেন ফার্মিং, কৃষিকাজ ও পশুপালনে। বলাবাহুল্য এই সবকিছুই তিনি করেছিলেন একেবারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। তৈরি করেছিলেন কো-অপারেটিভ ব্যাংক। এই শ্রীনিকেতন মডেলই যদি আজ ভারতের প্রত্যেকটি গ্রাম গড়ে ওঠে, তাহলে বিশ্বের দরবারে ভারত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে কৃষি প্রধান দেশগুলির কাছে একটি নজির তৈরি করবে। তাই স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে কৃষি প্রধান দেশ ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা উত্তর উত্তর বাড়ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

গবষণা সন্দর্ভটির পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়টির হল **মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১)**। এই পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়েছেন, নিজেকে একটি মূল্যায়নের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সে মূল্যায়ন হয়েছে স্মৃতিচারণের হাত ধরে। কখনও তা আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা, কখনও বা পাশ্চাত্যের ওপর অধিক বিশ্বাসের বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখ। আবার কখনো বা যে নারীকে একসময় তিনি কেবলমাত্র হৃদয়ের অধিকারী করে রেখেছিলেন, সেই নারীকে তিনি এইসময়ে ঘরের বাঁধন ভেঙ্গে বিশ্বের দরবারে হাজির হতে ডাক দিয়েছেন। আবার কখনও বা তাঁর শ্রীনিকেতনের কর্মীদেরকে আবদার করেছেন কয়েকটি স্বনির্ভর গ্রাম উপহার দেওয়ার জন্য। বিচ্ছিন্নতা নয়, বিরোধ নয় মানবতা দিয়েই তিনি সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুধু ভারতবাসী নয় সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাইতো তিনি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি আজও মানবজাতির পথপ্রদর্শক।

এই অধ্যায়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী মতানৈক্য নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

- কৌশাম্বী চক্রবর্তী, *পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবেদন,* প্রবাহ, প্রকাশকের নাম অনুপস্থিত, ২০১৬।
- ড. জাহিদা মেহেরুননেসা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা এবং আজকের দিনের সংকট,* ঢাকা: ই- পেপার, ২০১৬।
- ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কৃষক সমাজ,* ঢাকা: ই- পেপার, ২০১৯।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী,* কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১।
- দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
- রফিক আহমদ, *রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা,* ঢাকা: ই- পেপার, প্রকাশকাল অনুপস্থিত।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদক), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০।
- শাইখ সিরাজ, *রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা,* ঢাকা: ই- পেপার, ২০১১।
- শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা: বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, ১৯৬১।
- শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬৪।
- সুধীরচন্দ্র কর, *জনগণের রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৪৮।
- Best, J. W., Kahn, J. V. & Jha, A. K., *Research in Education*, Pearson, 2016.
- Bhattacharya, Sabyasachi. *Rabindranath Tagore: An Interpretation*, New Delhi: Penguin Books, 2011.
- Singh, A. K. *Test, Measurement and Research Methods in Behavioural Science*, New Delhi: Bharati Bhawan Publishers & Distributors, 2016.